রাজনৈতিক দলের সংস্কার: আমরা কোথায়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৬ আগস্ট, ২০০৯)

রাজনৈতিক দলের সংস্কার নিয়ে বহুদিন থেকেই নাগরিক সমাজের, বিশেষত 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর উদ্যোগে সারাদেশে আলাপ-আলোচনা চলছে। গণমাধ্যমের সহায়তায় এ ব্যাপারে ব্যাপক জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। জনমতের কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত ১১-দল এবং পরবর্তীতে মহাজোট রাজনৈতিক দলের সংস্কারের বিষয়টি তাদের 'ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচি'র অন্তর্ভুক্ত করে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের ভিত্তিতে দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনসহ অনেকগুলো সংস্কার ধারণা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। এরপর নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটি কিছু অতি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনসহ *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯ (আরপিও)* হিসেবে অনুমোদিত হয়। আইনে নিবন্ধিত দলগুলোর পক্ষ থেকে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর ছয় মাসের মধ্যে অনুমোদিত গঠনতন্ত্র কমিশনে জমা দেয়ার বিধান করা হয়।

আইনি বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন মহাজোটের প্রধান শরীক আওয়ামী লীগ ও অন্যতম শরীক জাতীয় পার্টি গত ২৪ জুলাই তাদের জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন ও দলীয় গঠনতন্ত্র অনুমোদন করেছে। জাতীয় সম্মেলন ও তৎপূর্ববর্তী পদক্ষেপ সমূহের মাধ্যমে আইনি বিধানগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। তা কতটুকু হয়েছে? রাজনৈতিক দলের সংস্কারের বিষয়ে ব্যাপক নাগরিক আকাঙ্ক্ষা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, তা নিরূপনের লক্ষ্যেই আজকের এই গোলটেবিল আলোচনা।

কেন রাজনৈতিক দলের সংস্কার

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন – রাজনৈতিক দল কীভাবে পরিচালিত হলো না-হলো, তাতে আমাদের মাথাব্যাথা কেন? এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার আমাদের কি কোন এখতিয়ার আছে? এছাড়াও রাজনৈতিক দল আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কি না?

রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যদিও অতীতে দল নিয়ে অনেকের মনে অনেক সংশয় ছিল। খোদ মার্কিন জাতির পিতাদের অনেকেই, এমনকি জর্জ ওয়াশিংটনও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অনেকে দলকে 'ইভিল' বা অনিষ্টকর বলেও আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ক্রমাগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বস্তুত, আজ সর্বজনবিদীত যে, রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। দলের ভূমিকা খর্ব হলে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হয়। আর গণতন্ত্র অকার্যকর হলে অগণতান্ত্রিক শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়।

যে কোনো দেশের প্রধান গণতান্ত্রিক শক্তি হলো সে দেশের রাজনৈতিক দল। অর্থাৎ দল গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি বা ইঞ্জিনস্বরূপ। ইঞ্জিন বিকল হলে যেমন গাড়ি চলতে পারে না, তেমনিভাবে বিকল রাজনৈতিক দল দিয়ে গণতন্ত্রকে সচল করা যায় না। তাই গণতন্ত্রের যথাযথ বিকাশের জন্য চাই কার্যকর রাজনৈতিক দল। দলে গণতন্ত্রের চর্চা না হলে এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা না থাকলে – এককথায়, কার্যকর রাজনৈতিক দল গড়ে না উঠলে – রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্থ হতে বাধ্য।

দল নিয়ে মাথা ঘামানোর এখতিয়ার অবশ্যই সকল নাগরিকের রয়েছে। রাজনৈতিক দল একটি সংবিধানস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দেয়া আছে। এছাড়াও ৭০ অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে – দল কর্তৃক মনোনীত কোনো সংসদ সদস্য দল থেকে পদত্যাগ করলে কিংবা দলের বিপক্ষে ভোট দিলে তিনি সদস্যপদ হারাবেন। উপরন্তু, সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে 'পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগ্যুলেশন' নামে একটি আইনও প্রণয়ন করা হয়, যা সম্ভবত এখনো বলবৎ আছে। *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯*সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ আইনেও রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব স্বীকৃত।

রাজনৈতিক দল প্রাইভেট ক্লাব নয়, তাই রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের ব্যাপারে জনগণের মাথা ঘামানোর অধিকার রয়েছে। কারণ দলের কার্যক্রমের ওপর পুরো রাষ্ট্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে, নির্ভর করে নাগরিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। এছাড়া প্রাইভেট ক্লাবও যা খুশি তা করতে এবং অন্যের স্বার্থহানি ঘটাতে পারে না। তাই রাজনৈতিক দল কীভাবে পরিচালিত হয় না-হয়, কাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কী কর্মসূচি গ্রহণ করে না-করে তা নিয়ে সজাগ থাকা প্রত্যেকের নাগরিক-দায়িত্ব। এ কারণেই রাজনৈতিক দলের সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রচেষ্টা

রাজনৈতিক দলের সংস্কার নিয়ে অতীতে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে ছিটেফোঁটা আলাপ-আলোচনা হলেও, 'সুজন' এ নিয়ে গভীর ও ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করে ২০০৪ সালে, যার সূচনা হয় ইংরেজী দৈনিক '*দি ডেইলী স্টার*' পত্রিকার সহায়তায় 'পলিটিক্যাল রিফর্মস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে ১০ এপ্রিল ২০০৫ *তারিখে প্রথম আলো* ও *দি ডেইলী স্টারে'র* সহায়তায় আরেকটি গোলটেবিল বৈঠকে সংস্কার প্রস্তাবগুলো আরও সুস্পষ্ট করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রস্তাবগুলো নিয়ে 'সুজনে'র সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাব্রতীদের উদ্যোগে সারাদেশে বিভিন্ন পরিসরে অসংখ্য আলাপ-আলোচনা, গোলটেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ নিবন্ধের লেখকও প্রস্তাবগুলো নিয়ে সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি করেছে। প্রস্তাবিত সংস্কার ধারণাগুলোর ভিত্তিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের একটি খসড়াও 'সুজনে'র পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারি, ২০০৫ সালে প্রকাশিত *দি ডেইলী স্টারে'র* ১৪তম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল জলিল ও বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়ার রাজনৈতিক দলের সংস্কার বিষয়ে মন্তব্য ছাপা হয়। রাজনৈতিক দলের বাধ্যবাধকতামূলক নিবন্ধনের বিষয়ে জনাব মান্নান ভূইয়া বলেন যে, এতে দল পরিচালনায় স্বাধীনতা খর্ব হবে। উভয়েই নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা নেই বলেও উল্লেখ করেন।

সংস্কার ভাবনাকে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে একটি বড় মাইলফলক ছিল ১৪ দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও গত সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার একটি সংবাদ সম্মেলন। এটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই। সংবাদ সম্মেলনে তিনি 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখা' উপস্থাপন করেন। এ রূপরেখায় 'নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার' শিরোণামে ১৫টি সুস্পষ্ট প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে 'নির্বাচনী আইন ও বিধি সংস্কারে'র লক্ষ্যে ১১টি শিরোণামে মোট ৩০টি প্রস্তাব পেশ করা হয়, যার শিরোনামগুলো ছিল: নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করা; প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ; প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা; নির্বাচনকে সন্ত্রাস, পেশিশক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমূক্ত করা; নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার রোধ করা; নির্বাচনে সবার

সমসুযোগ দান; নির্বাচন পরিচালনার স্বচ্ছতা বিধান; নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা; রাজনৈতিক দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও গণতন্ত্র চর্চা নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদেও এসকল সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

পরবর্তী সময়ে ২২ নভেম্বর, ২০০৫ তারিখের পল্টন ময়দানের জনসভায় ১৪ দলের পক্ষ থেকে একটি 'অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচী' ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণায় বলা হয়, '১৫ জুলাই ২০০৫ ঘোষিত অভিন্ন রূপরেখার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারসহ কালো টাকা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা হবে এবং এর মধ্য দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।' তাই এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সংস্কারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সংস্কার আলোচনার আরেকটি মাইলফলক ছিল 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)', *প্রথম আলো* ও *দি ডেইলি স্টার*'র যৌথ উদ্যোগে ২০ মার্চ ২০০৬ তারিখে 'জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ' শীর্ষক আলোচনা এবং পরবর্তী সময়ে 'নাগরিক কমিটি' গঠন। এ কমিটির উদ্যোগে এবং চ্যানেল আই-এর সহযোগিতায় সারা দেশে ১৫টি নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে সংস্কার বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

এ পর্যায়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সমাজের সর্বস্তরের অনেক নাগরিক সংস্কার আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ফলে দেশব্যাপী এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং রাজনৈতিক সংস্কার একটি গণদাবিতে পরিণত হয়।

এমনি প্রেক্ষাপটে, ২০০৭ সালের শেষের দিকে, নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সচেতন নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সংস্কার বিষয়ে মতবিনিময়ে লিপ্ত হয়। ব্যাপক মতবিনিময়ের ভিত্তিতে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যও সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যাতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রস্তাব স্থান পায়। সংস্কার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলগুলোর বাধ্যতামূলক নিবন্ধন, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা হয়। *অধ্যাদেশে'র* ৯০বি ধারায় অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো হলো: 'যদি কোন রাজনৈতিক দল ... কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হতে চায়, তাহলে তার গঠনতন্ত্রে নিম্নের সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে,– যেমন ... ৯০(বি)(১)(খ)(i) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত হবার; (ii) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্যপদ নারীদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য এবং এ লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ অর্জন করবার; (iii) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অথবা ছাত্র অথবা আর্থিক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী-কর্মকর্তা অথবা শ্রমিকদের অথবা অন্য কোন পেশার সদস্যদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ রাখবার; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কিছুই তাদেরকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হবার অথবা সংগঠন, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি গঠন করবার এবং সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চা করবার, এবং ব্যক্তি হিসেবে, বিদ্যমান আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হবার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। (iv) কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ক্ষেত্রমত ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা বা জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণের তৈরি প্যানেলের ভিত্তিতে মনোনয়ন চূড়ান্ত করবার।'

এছাড়া *অধ্যাদেশে* নিবন্ধন বাতিলের বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। *অধ্যাদেশে*'র ৯০(জ) ধারা অনুযায়ী, কোনো রাজনৈতিক দল *অধ্যাদেশে*'র ৯০(বি)(১)(খ) ধারা লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন যথাযথ পদ্ধতির মাধ্যমে দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে। অর্থাৎ দল গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত না হলে, কমিটিতে ২০২০ সালের মধ্যে ৩৩ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত না হলে, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করা না হলে, সকল স্তরের কমিটি কর্তৃক তৈরি প্যানেলের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড মনোনয়ন না দিলে, দলের নিবন্ধন বাতিল করার ক্ষমতা কমিশনকে *অধ্যাদেশে*'র মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা প্রায় সোয়া শ' *অধ্যাদেশে*'র মধ্যে যে সীমিত সংখ্যক নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অনুমোদন লাভ করে, তার মধ্যে *আরপিও* অন্যতম। তবে অনুমোদনকালে সংসদ এতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে, বিশেষত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে। যদিও নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলোতে – ৯০বি(১)(খ) ধারায় – কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়নি, শর্ত অমান্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলের ক্ষমতা চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে।

সংসদ অনুমোদিত *আরপিও*'র নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কিত বিধান – ৯০এইচ – অনুযায়ী, শুধুমাত্র ৯০বি(২) এবং ৯০বি(৪) উপধারার বিধান লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে। ৯০বি(২) ধারাতে বলা আছে যে, 'স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সদস্য অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে, কেবলমাত্র তাহার যোগদানের ফলে ঐ দল কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধনের যোগ্যতা অর্জন করবে না।' যেহেতু কোন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য অনিবন্ধিত দলে যোগদান করলে সংশ্লিষ্ট দল নিবন্ধিত হবার যোগ্যতাই অর্জন করবে না, তাই কোন নিবন্ধিত দলের পক্ষে এটি ভঙ্গ করার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে এটি নিবন্ধন বাতিলের কোন শর্তই হতে পারে না। অর্থাৎ নিবন্ধন বাতিলের এ বিধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, আইনে ৯০বি(৪) বলতে কোন ধারাই *আরপিও*'তে নেই।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯-এর নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কিত বিধান (৯০এইচ) থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো অমান্য করলেও নির্বাচন কমিশনের কিছু করার থাকবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা না করলে, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো বিলুপ্ত না করলে এবং তৃণমূলের সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করলেও নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে না – আইনের মাধ্যমে সে ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দলগুলো নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভঙ্গ করলেও এর কোনো 'কনসিকুয়েন্স' বা শাস্তির বিধান আর রইলো না। ফলে নিবন্ধনের শর্ত মানা না-মানা রাজনৈতিক দলের জন্য এখন বাধ্যতামূলক (directory) না হয়ে ঐচ্ছিক (mandatory) বিষয়ে পরিণত হলো। তাই আমাদের মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা আইনের মাধ্যমে কমিশনকে নিতান্তই কাগুজে বাঘে পরিণত করা হলো।

এ প্রসঙ্গে আবারো স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট তাদের ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে পল্টন ময়দান থেকে ঘোষিত 'অভিন্ন নূন্যতম কর্মসূচী'র মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সংস্কারে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপের সময় আওয়ামী লীগ ৯০বি(১)(খ)-এ অন্তর্ভুক্ত শর্তাবলীর কোনোটি সম্পর্কেই দ্বিমত করেন নি (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, *নির্বাচনী আইনের সংস্কার: রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সংলাপের প্রতিবেদন*, ২০০৮)। তাহলে কি *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইনে*'র ৯০এইচ ধারায় – নির্বাচন কমিশনের দাবি অনুযায়ী – একটি করণিক ভ্রান্তি বিরাজমান? না-কি ইচ্ছাকৃতভাবে কমিশনের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে? তবে এ ব্যাপারে সরকারের নীরবতা সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না।

আইনি বিধান বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা

এটি সুস্পষ্ট যে, রাজনৈতিক দলগুলো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা চরমভাবে খর্ব করেছে। শুধু তাই নয়, দুর্বল আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তারা দারুন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বস্তুত, কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ছিল 'হাফ-হার্টেড' বা আধা-আন্তরিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপেক্ষামূলক।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধিত) আইনে'র ৯০ডি ধারা অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের অধীনে, ৯০বি ধারার শর্তসাপেক্ষে, নিবন্ধিত দলগুলোর জন্য নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর ছয় মাসের মধ্যে কাউন্সিল অনুমোদিত গঠনতন্ত্র কমিশনে জমা দেয়া বাধ্যতামূলক। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল – আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি – নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই, ২৪ জুলাই, তাদের দলীয় কাউন্সিলের আয়োজন করেছে এবং পরদিন কমিশনে তাদের অনুমোদিত গঠনতন্ত্র জমা দিয়েছে। তাই দল দু'টি আক্ষরিক অর্থে আইনের এ বিধান মান্য করেছে, যদিও আইনের চেতনা ও কিছু সুস্পষ্ট বিধান তারা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। অন্যদিকে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, বিএনপি, এ বিধানটি মানার ক্ষেত্রে ছিল সম্পূর্ণ অপারগ এবং তারা কমিশনের কাছে নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন করেছে। জামায়াত-ই-ইসলামও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের গঠনতন্ত্র কমিশনের কাছে দাখিল করেছে, যদিও তাদের দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের কথা আমরা শুনিনি।

তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান [৯০বি(১)(খ)(iv)], যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারি করা *অধ্যাদেশে*ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আওয়ামী লীগ তাদের তৃণমূলের কমিটিগুলো থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেছে, যদিও সবক্ষেত্রে তা অনুসরণ করেনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুপারিশের তালিকায় শীর্ষে থাকা, এমনকি একক সুপারিশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও মনোনয়ন বঞ্চিত করেছে। বিএনপি আইনের এ বিধানটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। জাতীয় পার্টিও আইনের এ বাধ্যবাধকতার প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করে নি। জামায়াত-ই-ইসলামী কী করেছে তা আমাদের জানা নেই। তবে নির্বাচন কমিশন *অধ্যাদেশে*'র এ বিধান উপেক্ষা করার বিষয়ে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে নি।

দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন যে, আওয়ামী লীগ সাহসি ও দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ নেবে। তারা দলের সর্বস্তরের কমিটিগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করবে। কাউন্সিলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক। আওয়ামী লীগ অতীতে যা করেছে, এবারও তা-ই করেছে। কাউন্সিলে উপস্থিত ডেলিগেটগণ সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ষষ্ঠবারের মতো দলের সভাপতি এবং তারই আস্থাভাজন মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছেন। একইসাথে সভাপতিকে দলের অন্যান্য কমিটি গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এ কথা সত্য যে, কাউন্সিলের পক্ষ থেকেই শেখ হাসিনার ওপর সর্বসম্মতিক্রমে দলের অন্যান্য কমিটি গঠনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। এটি একটি সামন্তবাদী প্রথা এবং কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরো একধাপ এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে শেখ হাসিনা কৃতজ্ঞচিত্তে এ দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানাতে পারতেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকসহ দলের অন্যান্য পদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের আয়োজন করতে পারতেন।

নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যারা সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদে নির্বাচিত হতে আগ্রহী। কিন্তু নেত্রীর বিরাগভাজন হওয়ায় আশংকায় কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পাননি। অভয় পেলে এবং গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে, অনেকেই এগিয়ে আসতেন। কিন্তু তা না হওয়ার কারণে দলে গণতন্ত্র চর্চার এবং রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিকাশের একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হলো। একইসাথে শেখ হাসিনা নিজেও বঞ্চিত হলেন বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতা থেকে একজন কালজয়ী মহান নেতায় পরিণত হওয়ার সুযোগ থেকে। এছাড়াও গোপন ব্যালটে দলীয় নেতা-নেত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নুতন রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি হতো, যা করতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরবর্তীতে সভানেত্রী শেখ হাসিনা যে কমিটির নাম ঘোষণা করেছেন তাও অনেককে নিরাশ করেছে। আওয়ামী লীগের চারজন 'বিতর্কিত' নেতাকে সভাপতিমণ্ডলী থেকে সরিয়ে ক্ষমতাহীন উপদেষ্টার আসনে বসানো হয়েছে। একইসাথে অধিকাংশ তথাকথিত সংস্কারবাদীকে দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলো থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। সংস্কারবাদীরা দলের ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে কুক্ষিগত হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং দলে সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন, যদিও তাঁদের কারো কারোর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনাকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিরুদ্ধমত ধারণ করা ও প্রতিবাদী হওয়ার স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল কথা। বস্তুত মনীষি এরিস্টটলের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো নাগরিকের স্বাধীনতা। আর গণতান্ত্রিক চর্চার সত্যিকারের ও সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটে শতমতের সহাবস্থানের মাধ্যমে, যা আওয়ামী লীগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়াও আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সরকারি ও দলীয় ক্ষমতা আবারো একইহাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে, প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসার ভাষায়, সরকার কর্তৃক গলাধঃকরণের কারণে দলের নিষ্ক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে দল হিসেবে আওয়ামী লীগে এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে 'এক নেতা-এক কথা'র সংস্কৃতি গড়ে উঠার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যার পরিণতি অশুভ হতে বাধ্য। কারণ এর ফলে দলের পক্ষ থেকে সরকারকে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় ব্যক্তিদের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলার তথা তাঁদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সুযোগ আর থাকবে না।

জাতীয় পার্টির তৃণমূলের কমিটিগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। কেন্দ্রীয় কমিটিও নির্বাচিত হয় নি, বরং দলীয় কাউন্সিলে দলের প্রধান জেনারেল এরশাদ কৌশলগত কারণে কিছু দিনের জন্য সরে দাঁড়ালেও আজীবন দলের চেয়ারম্যান থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে যা *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইনে*'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অনেকের মতে, এমনকি এ ঘোষণা ছিল শিস্টাচারবোধেরও পরিপন্থি। এছাড়াও দলীয় কমিটিগুলোও অতীতের ন্যায় জেনারেল এরশাদ এককভাবে গঠন করেছেন।

অনেক নাগরিক বিশেষভাবে হতাশ হয়েছেন এই দেখে যে, আওয়ামী লীগ কয়েকটি অঙ্গ সংগঠনকে সহযোগী সংগঠন বলে নাম পরিবর্তনের একটি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু 'খেলা' খেলেছে। অঙ্গ সংগঠনগুলোতে সহযোগী সংগঠন বললে নামের পরিবর্তন হবে কিন্তু দিনবদল হবে না – যদিও দিনবদল আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ ছাড়াও সহযোগী সংগঠন রাখাও *আরপিও*'র সুস্পষ্ট লংঘন। বিলুপ্ত না করে ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগকে স্বাধীন করে দিলে এ সংগঠন দু'টির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোন গুণগত পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা দুরাশা মাত্র। ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের নামে যে অপকর্ম পরিচালিত হয়, তার বিরূদ্ধে আজ সারাদেশে ব্যাপক জনমত বিরাজ করছে। অনেকে আশা করেছিলেন যে, আইন ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আওয়ামী লীগ কিছু কঠোর এবং 'পেইনফুল' বা যন্ত্রণাদায়ক সিদ্ধান্ত নেবে, যা দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। উল্লেখ্য যে, কয়েক মাস আগে বিএনপিও ছাত্রদলকে পুনর্গঠিত করেছে, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সম্পর্কিত আরপিও'র বিধানের তোয়াক্কা না করেই।

এটি সুস্পষ্ট যে, আইন অমান্যের বা আইনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অতীতের সংস্কৃতি থেকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এখনো বেরিয়ে আসতে পারে নি। তারা সদ্ব্যবহার করতে পারে নি একটি সূবর্ণ সুযোগের, যে অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল গত ২৯ ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তীকালে। সুযোগটি ছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কতগুলো সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের নড়বড়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করানোর। অতীতেও অবশ্য আমরা আরো অনেকগুলো সুযোগ হাতছাড়া করেছি।

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর প্রথম সুযোগ সৃষ্টি হয় গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, নব্বইয়ের গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত 'তিন জোট' একটি যুক্ত ঘোষণা প্রদান করে। যুক্ত ঘোষণায় একটি অন্তবর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনের লক্ষ্যে কতগুলো দাবি উত্থাপন করা হয়। আরো উত্থাপন করা হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আচরণবিধি। একইসাথে যুক্ত ঘোষণায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং সংসদের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করাসহ রাষ্ট্রে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার অঙ্গীকার যুক্ত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৯১-এর পর কোন নির্বাচিত সরকারই এ সকল অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে কোনো আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।

আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৯৪ সালের মাগুরার উপনির্বাচনের পর। সে উপনির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশন তা বন্ধের কোনো ফলপ্রসূ উদ্যোগ নিতে পারে নি। এমতাবস্থায়, প্রয়োজন ছিল দলের নেতা-কর্মীদের সদাচারণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। একইসাথে প্রয়োজন ছিল নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা। কিন্তু এ দু'টির কোনোটাই না করে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি উদ্ভট ব্যবস্থার আবিস্কার করেছি। ভাবনা ছিল এমন যে, দলীয় সরকারের আমলে সৃষ্ট সকল জঞ্জাল একদল 'ফেরেস্তা' এসে তিন মাসে সাফ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন। বস্তুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা আবারো সমস্যা এড়িয়ে গেলাম বা গালিচার নিচে লুকিয়ে রাখলাম। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এটি পরিস্কার যে, সমস্যা এড়িয়ে গেলে কিংবা লুকিয়ে রাখলে, তা দূরীভূত হয়ে যায় না। বরং তা আরো ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হয় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। ১/১১ এবং তার পরবর্তী বেদনাদায়ক ঘটনাবলী যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে *অধ্যাদেশে*'র মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য, কতগুলো শর্তসাপেক্ষে, নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হলেও, নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাশ করা *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইনে*'র দ্বারা শর্তগুলো চরমভাবে শিথিল করা হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধনের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো – দলে গণতন্ত্রের চর্চা, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিলুপ্তি, দলের তৃণমূলের কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ – অমান্য করলেও কমিশন দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে না। অর্থাৎ আমাদের নির্বাচিত সরকার নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাহীন কাগুজে বাঘে পরিণত করেছে। নিঃসন্দেহে এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের সংস্কার উদ্যোগ দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হলো।

এছাড়াও আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন ছিল নিয়ম মানার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। দল দু'টো নিয়ম মেনেছে – ছয় মাসের মধ্যে দলের সংশোধিত ও অনুমোদিত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছে – কিন্তু নিয়মগুলো, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'মনে' নিতে পারে নি। তারা *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইনে*'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। তারা অতীতের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অতীতে যেমনিভাবে হয়েছে, এবারকার কাউন্সিলও অনেকটা তেমনিভাবেই হয়েছে। আবারো দলে গণতন্ত্রায়নের এবং অঙ্গ সংগঠন নিয়ে সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের বিষয়ে আমরা বেশি দূর এগুতে পারি নি, বরং অনেকটা পিছিয়েই গিয়েছি। তাই জাতি গণতান্ত্রিক চর্চায় আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। একইসাথে শেখ হাসিনাও বঞ্চিত হলেন একটি অনন্য 'লিগেসি' বা উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার সুযোগ থেকে, যা তাকে জাতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় করে রাখতো।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, সমস্যার সমাধান না হলে বা সমস্যা এড়িয়ে গেলে পরবর্তীতে তা আরো জটিল আকার ধারণ করে ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে জেন্টস হেরিংটনের সাবধান বাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'দ্য কমনওয়েলথ অব ওসিয়ানা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, আইন হলো শব্দ আর কাগজ, মানুষের হাত আর তরবারি ছাড়া (The law is but words and paper without the hands and swords of men)। অর্থাৎ আইন যেখানে জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ, সেখানে মানুষের হাত ও তরবারি সামনে এস যায়। ফলে যথেচ্চারারের সূচনা হয়। আমরা নিশ্চয়ই ওইদিকে যেতে চাই না। আশা করি, আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাববেন এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের গণতান্ত্রিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর একটি অনন্য সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। অতীতেও ...

- নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সাথে ব্যাপক আলোচনা ও

রাজনৈতিক দলের সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়ন

- নির্বাচন কালে প্রার্থী মনোনয়ন
- রাজনৈতিক দলের কাউন্সিল
- ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংস্কারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
- জাতীয় পার্টি: কৌশল অবলম্বন ও তার পরিণাম
- গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন
- তথাকথিত সংস্কার পন্থীদেরকে বাদ দেয়া: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো স্বাধীনতা – এরিস্টটল
- আবারো সুযোগ নষ্ট: অজাযুদ্ধে শুধুই আঁটুনি সার

দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। দলের মাধ্যমেই অতীতে দুর্নীতির রাজনীতিকীকরণ এবং রাজনীতির দুর্নীতিকীকরণ সাধিত হয়েছে। দলগুলো সিন্ডিকেটের মতো আচরণ করেছে। জনকল্যাণের পরিবর্তে বহুলাংশে দলীয় নেতা-নেত্রী এবং তাদের আশির্বাদপুষ্টদের স্বার্থে কাজ করেছে। গত ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও সে সুযোগটি জাতির জন্য হাতছাড়া হয়েছে বলে আমাদের আশঙ্কা হয়।

অতীতেও আমরা অনেকগুলো সুযোগ হাতছাড়া করেছি। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানোর প্রথম সুযোগ সৃষ্টি হয় গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের পর। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, নব্বইয়ের গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃত্বে গঠিত 'তিন জোট' একটি যুক্ত ঘোষণা প্রদান করে। যুক্ত ঘোষণায় একটি অন্তবর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকার গঠনের লক্ষ্যে কতগুলো দাবি উত্থাপন করা হয়। আরো উত্থাপন করা হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আচরণবিধি। একইসাথে যুক্ত ঘোষণায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং সংসদের মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগকে স্বাধীন করাসহ রাষ্ট্রে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার অঙ্গীকার যুক্ত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৯১-এর পর কোন নির্বাচিত সরকারই এ সকল অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে কোনো আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে নি।

আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৯৪ সালের মাগুরার উপনির্বাচনের পর। সে উপনির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিল এবং নির্বাচন কমিশন তা বন্ধের কোনো ফলপ্রসূ উদ্যোগ নিতে পারে নি। এমতাবস্থায়, প্রয়োজন ছিল দলের নেতা-কর্মীদের সদাচারণ ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। একইসাথে প্রয়োজন ছিল নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা। কিন্তু এ দু'টির কোনোটাই না করে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো একটি উদ্ভট ব্যবস্থার আবিস্কার করলাম! ভাবনা ছিল এমন যে, দলীয় সরকারের আমলে সৃষ্ট সকল জঞ্জাল একদল 'ফেরেস্তা' এসে তিন মাসে সাফ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন। বস্তুত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা আবারো সমস্যা এড়িয়ে গেলাম বা গালিচার নিচে লুকিয়ে রাখলাম। গত দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এটি পরিস্কার যে, সমস্যা এড়িয়ে গেলে কিংবা লুকিয়ে রাখলে, তা দূরীভূত হয়ে যায় না। বরং তা আরো ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভূত হয় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়।

আরেকবার সুযোগ সৃষ্টি হলো গত ২৯ ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাশ করা *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন*-এ রাজনৈতিক দলকে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জনকল্যাণমূখী করার অনেকগুলো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্বাচন কমিশনের অধীনে দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন যার অন্যতম। নিবন্ধনের লক্ষ্য হলো রাজনৈতিক দলকে একটি আইনের কাঠামোর মধ্যে আনা, যাতে এগুলো যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে না পারে।

উপসংহার: বিজনেস এ্যাজ ইউজুয়্যালের পরিণতি

তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাউন্সিল করার মাধ্যমে আক্ষরিক অর্থে আইনের বিধান মানা হলো;

- ভূমিকা: জনমত, সংস্কারের উদ্যোগ
- কেন রাজনৈতিক দলের সংস্কার
- সংস্কার প্রচেষ্টা: আবারো সুযোগ নষ্ট

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের ২৫(১)(ক) ধারায় বলা হয়েছে: "মহিলা আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ, যুবলীগ, আইনজীবী পরিষদ, তাঁতী লীগ, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ ও যুব মহিলা লীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে গণ্য হবে।'

ছাত্র ও শ্রমিক লীগ সম্পর্কে স্থায়ী গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'তবে জাতীয় শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ তাদের নিজ নিজ সংঠনের গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হবে।'

স্থায়ী গঠনতন্ত্রের ৬৩ ধারায় শিরোনামে 'প্রবাসী সংগঠন'-এর পরিবর্তে 'প্রবাসে সংগঠন' উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, 'আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে বিভিন্ন দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী সংগঠন করতে পারবে।'

আওয়ামী লীগের স্থায়ী গঠনতন্ত্রের ২৭(ঙ) ধারায় বলা হয়েছে, 'উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/ পৌর ওয়ার্ড ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী সংসদীয় আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রার্থীদের গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে তাদের সুপারিশসংবলিত একটি প্রার্থী প্যানেল নিজ নিজ সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড বরাবর প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড একজনের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করবে।'

নারী গঠনতন্ত্রে ৫(৩)(ক) ধারা সংযুক্ত করে বলা হয়েছে, '২০২০ সালের মধ্যে দলের কার্যনির্বাহী সংসদসহ দলের সর্বস্তরের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নারী-পুরুষের সমতা আনার লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে এ অনুপাত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।'